

# কাফিরদের সাথে কঠোরতা



মুফতি তারেকুজ্জামান

# কাফিরদের সাথে কঠোরতা: ইসলাম কী বলে ?

লেখক

মুফতি তারেকুজ্জামান

প্রকাশনায়



ইসলামি বই

[www.facebook.com/groups/islamiboiBD](http://www.facebook.com/groups/islamiboiBD)



---

## কাফিরদের সাথে কঠোরতা: ইসলাম কী বলে ?

লেখক : মুফতি তারেকুজ্জামান

প্রকাশনায় : ইসলামি বই

প্রকাশকাল : শাবান, ১৪৪১ হিজরি।

(বিনামূল্যে বিতরণ এর জন্য প্রকাশিত)

---

---

## Strictness Towards the Kuffar: An Islamic Perspective.

Written by MUFTI TAREKUZZAMAN

Published by ISLAMI BOI

Published on Shaaban, 1441 AH

(Published for free distribution)

---



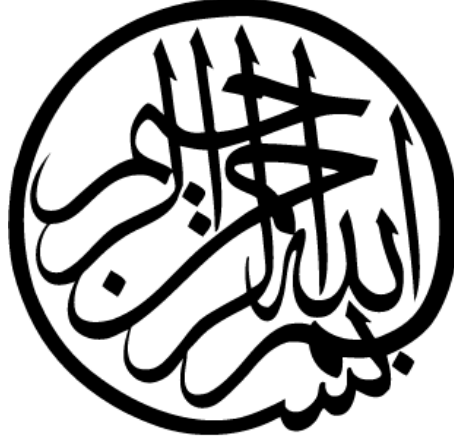
“সঠিক ইলম ও প্রজ্ঞা বিনুস্ত হওয়ার পাশাপাশি বর্তমানে ভয়ংকর যে বঙ্গপারটি লক্ষ করা যাচ্ছে, তা হলো, যারা ইলম জানে না, ইলমের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং ইলমের গভীরতা বোঝে না, তাদের থেকেই ইদানিং ইলম নেওয়া হচ্ছে এবং সে ইলমের ভিত্তিতে বিভিন্ন উদ্ভূত ফতোয়া দিয়ে উম্মাহর স্বীকৃত আকিদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

হাদিসেও অবশ্য শেষ জমানার ফিতনার লিস্টে এটা বেশ গুরুত্ব সহকারেই বর্ণিত হয়েছে যে, ‘সে সময় অনুপযুক্ত লোকেদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হবে, আরা তারা সঠিক মাসআলা না জানা সত্ত্বেও ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হবে, জাতিকেও গোমরাহ করবে।’

যত দিন যাচ্ছে, হাদিসে বর্ণিত সে ফিতনার রূপ ততটাই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। সতর্ক করেও মানুষকে ফেরানো যাচ্ছে না। আর হাদিসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, তখন ফেরানোর লোকও কম থাকবে, আর ফেরার লোকও কম হবে। জনপ্রিয়তা ও বাকপটুতা দিয়েই তারা জাহিল শ্রেণির মানুষকে নিজদের দিকে আকৃষ্ট করে রাখবে, হকপন্থী প্রাজ্ঞ আলিমদের থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যাবে এবং নিজদের বুঝমতো মাসআলা-মাসায়িল বয়ান করে নিজেরাও ভুল পথে যাবে, অন্যদেরও সে পথে আহ্বান করবে।

বর্তমান বাস্তবতায় এটা বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই জানে না, বাকপটুতা আর ইলম এক জিনিস নয়। আল্লাহর কাছে আমরা সব ধরনের ফিতনা থেকে পানাহ চাই।”





প্রায় এক শতাব্দি হতে চলল, আমাদের থেকে খিলাফত বিদায় নিয়েছে। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই কুফফার গোষ্ঠীর প্রথম ও প্রধান টার্গেট ছিল খিলাফতের মূলোৎপাটন। যুগে যুগে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের মাধ্যমে তারা খিলাফত ধ্বংসের চেষ্টা করেছে। এতে কখনো সাময়িক সফলতা পেলেও পরে আবার ঠিকই খিলাফত ফিরে এসেছে। অনেক দুর্বলতা ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের খিলাফত টিকে ছিল দীর্ঘ তেরো শতাব্দিকালেরও অধিক সময় ধরে। শেষে এ উম্মাহ থেকে যখন কল্যাণের সর্বশেষ বিন্দুটুকুও আল্লাহ উঠিয়ে নিলেন, তখন খিলাফতব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ল। এরপর থেকে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ভুলভাবে চেষ্টা করায় সে খিলাফত আর ফিরে আসেনি। খিলাফত-পরবর্তী এ শতাব্দিতে বিশ্বকে শাসন করেছে কুফফার গোষ্ঠী ও তাদের তাবেদার নামধারী কিছু মুসলিম নামের মুরতাদরা। আর এ সময়টিতেই তারা মুসলমানদের ইমান-আকিদা ও নৈতিকতার ওপর আঘাত হেনেছে পূর্ণ শক্তিতে। এক্ষেত্রে তাদেরকে অনেকটা সফলও বলা যায়। বর্তমানে আমরা চারদিকে মুসলিম নামে যাদের দেখি, তাদের অধিকাংশেরই আজ না ঠিক আছে আকিদা, না আছে সঠিক ইলম, আর না আছে নৈতিকতা। বরং ইদানিং তো অনেকের ইমানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং কারও কারও ইমান চলেও যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে আমরা এ ভয়ংকর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।



দীর্ঘদিন ধরে কাফিরদের শাসনব্যবস্থায় থাকার কারণে বর্তমান উদারমনা মুসলিমদের মনে একটি বাতিল আকিদা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, মানবতা আগে, ধর্ম পরে। মানুষ পরিচয় প্রথমে, অন্য পরিচয় দ্বিতীয় স্তরে। মানবতার জয়গান গেয়ে তারা তাদের দুনিয়ার প্রভুদের খুশি করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে; আর ওদিকে তাদের প্রভুরা তাদেরই জাতি ভাইদের হত্যা, বোনদের ধর্ষণ, শিশুদের নির্যাতন ও মুসলিম জনপদ বিরান করতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। এতসব অপকর্ম সেরে মিডিয়ায় আবার উল্টো প্রচার করে যে, পুরো বিশ্বে তারা শান্তির বার্তা পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। তাদেরকে যারা বাধা দিচ্ছে, তারা হলো টেরোরিস্ট, তারা হলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী। আমাদের বোকা মুসলিম জাতিও তাদের এ শেখানো বুলি গোত্রাসে গিলছে। তাদের প্রতিটি কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে নিচ্ছে। এভাবেই পুরো পৃথিবীজুড়ে কুফফার গোষ্ঠী শুধু আমাদের জাগতিক স্বাধীনতাই ছিনিয়ে নেয়নি; বরং আমাদের সবচেয়ে দামী সম্পদ ইমান ও বিশুদ্ধ আকিদাও ছিনিয়ে নিয়েছে। চতুর্মুখী এ লাঞ্ছনার সময়ে যারা উম্মাহকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে তাদেরকে বাস্তবতা ও সত্যিটা বুঝানোর চেষ্টা করছে, তখন নিজেদের লোকেরাই তাঁদেরকে উগ্রপন্থী, নির্দয় ও ক্ষেত্রবিশেষে সন্ত্রাসী ট্যাগেও অভিহিত করছে। হায়! গোলামির এ জিজির যে শুধু দেহকেই নয়; বরং অন্তরসহ আমাদের পুরো অস্তিত্বকেই বন্দি করে ফেলেছে!

আজ আসুন, একটু খোলা মনে এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখি, কাফিরদের ব্যাপারে আমাদের এ নমনীয়ভাব আমাদের ইমানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো! কাফিরদের ব্যাপারে আমরা কেমন আকিদা ও মনোভাব রাখব এবং তাদের বিপদাপদে, মৃত্যুতে বা কষ্টে খুশি হওয়া যাবে কিনা, সে ব্যাপারটিতে অনেক মুসলিম ভাই-ই চিন্তায় থাকেন। তাদের জন্যই মূলত আমাদের আজকের আলোচনা। আর যারা এসব নিয়ে চিন্তা করেন না, যারা ইসলামের ওপর মানবতার ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, যারা পূর্ব থেকেই নিজেদের উদার ভেবে থাকেন এবং আজীবন নিজেদের আবিষ্কৃত উদারতার ওপরই অটল থাকতে চান, তাদের নিয়ে আমাদের কোনো কথা নেই। তাদের রাস্তা আর আমাদের রাস্তা ভিন্ন। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো



পথকেই প্রথম ও চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করি। সাহাবায়ে কিরাম রা. যেভাবে তাঁদের প্রিয় রাসুলের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করেছেন, সেটাকেই আমরা সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতি মনে করি। আর পরবর্তী সালাফ তাঁদের থেকে কুরআন-সুন্নাহ যেভাবে বুঝেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বুঝিয়েছেন, আমরা সেসব বুঝকেই আমাদের দ্বীন ও আকিদার জন্য নিরাপদ মনে করি। এ ভিত্তিতেই আজ আমরা মূল আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আশা করি, এতে সত্যানুসন্ধানীদের জন্য থাকবে পর্যাপ্ত খোরাক, আর সংশয় পোষণকারীদের জন্য থাকবে সকল সংশয়ের নিরসন, ইনশাআল্লাহ।



## ব্যাপকভাবে কাফিরদের সাথে কঠোরতাঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। আর তাঁর সহচরগণ কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর  
এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।’

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের গুণের প্রশংসা করে বলছেন যে, তাঁরা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর। এখানে কাফির বলতে সব শ্রেণির কাফিরের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর الْكُفَّارِ মধ্যে ‘আলিফ-লাম’ জিনসি বা ইসতিগরাকি। জিনসি হলে অনুবাদ হবে, ‘তাঁরা কাফির জাতির ওপর কঠোর।’ আর যদি ইসতিগরাকি নেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে ‘তাঁরা সকল কাফিরের ব্যাপারে কঠোর।’ এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত ইসতিগরাকির অর্থ নেওয়াকে উত্তম মনে করলেও যারা সূক্ষ্মভাবে ভাবতে পারেন, তারা জানেন, এখানে ইসতিগরাকির চাইতে জিনসির অর্থ নেওয়াই বেশি উত্তম। উভয়টির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য রয়েছে, যা ইলমুল বালাগাত সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ আলিম ছাড়া সাধারণদের বুঝা কষ্টকর হবে। মোটকথা, যে অর্থই নেওয়া হোক না কেন, এখানে ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে। ব্যাপকভাবে কাফিরদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মনোভাব এমন কঠোরই ছিল। তাঁরা সাধারণভাবে কাফিরদের সাথে নমনীয়তা দেখাতেন না, তাদের সামনে হাসিখুশি থাকতেন না এবং তাদের ক্ষেত্রে শরিয়া-অনুনোমদিত ও অপ্রয়োজনীয় কোনো ছাড় দিতেন না।





আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَهَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ شَدِيدًا غَنِيْفًا عَلَى الْكَافِرِ، رَحِيمًا بَرًّا بِالْأَخْيَارِ،  
غَضُوبًا غَبُوسًا فِي وَجْهِ الْكَافِرِ، ضَحُوكًا بَشُوشًا فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ

এটাই হলো মুমিনদের বৈশিষ্ট্য যে, তাদের প্রত্যেকেই কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও অনমনীয় হবে, আর নেককার মুমিনদের ক্ষেত্রে সদয় ও উত্তম আচরণকারী হবে। কাফিরের সামনে ক্রোধান্বিত ও রুঢ় থাকবে, আর তার মুমিন ভাইয়ের সামনে সদাহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে।<sup>২</sup>

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ  
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, (তাহলে জেনে রেখো,) অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।<sup>৩</sup>

এ আয়াতে الْكَافِرِينَ শব্দটি বহুবচন, যাকে আরবিতে ‘আল-জামউস সালিম’ বলা হয়। ‘আল-জামউস সালিম’-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষাশাস্ত্রের একটি মূলনীতি হলো, এতে ব্যবহৃত ‘আলিফ-লাম’ ইসতিগরাকির জন্য আসে। সুতরাং এখানে অর্থ হবে, সকল কাফিরের ওপর। এ থেকে আংশিক বা কতিপয় কাফির অর্থ বুঝার কোনো সুযোগ নেই। নাহ্, সরফ, ইশতিকাক ও বালাগাত সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ সকল আলিমের এ মূলনীতিটি জানা আছে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা



যেসব মুমিনকে ভালোবাসেন, তাঁদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো, মুমিনদের প্রতি সদয়ভাব ও কাফিরদের সাথে কঠোরভাব। অর্থাৎ যেসব মুমিন কাফিরদের সাথে কঠোরতা দেখায় এবং শত্রুতা পোষণ করে, পাশাপাশি মুমিনদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। মুমিনদের এ পারস্পরিক হৃদয়তা অনেকটা পিতা-পুত্রের হৃদয়তার মতো, আর কাফিরদের সাথে তাদের মনোভাব অনেকটা শিকার ও শিকারির মতো।

ইমাম কুরতুবি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

أَذِلَّةٌ نَعَتْ لِقَوْمٍ، وَكَذَلِكَ " (أَعَزَّةٌ) " أَي يَرَأْفُونَ " قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) بِالْمُؤْمِنِينَ وَيَرْحَمُونَهُمْ وَيَلِينُونَ لَهُمْ... وَيَغْلُظُونَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَيُعَادُونَهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالسَّيِّدِ لِلْعَبْدِ، وَهُمْ فِي الْغِلْظَةِ عَلَى الْكُفَّارِ كَالسَّبْعِ عَلَى فَرَسِهِ

আল্লাহর বাণী “মুমিনদের প্রতি হবে কোমল” এটা قَوْم বা “সম্প্রদায়” এর সিফাত (গুণ), অনুরূপ “কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর” কথাটিও قَوْم বা “সম্প্রদায়” এর সিফাত। অর্থাৎ মুমিনরা মুমিনদের প্রতি সদয় হবে, তাদের প্রতি দয়া দেখাবে এবং নম্র হবে। ...আর তাঁরা কাফিরদের ব্যাপারে কঠোরতা দেখাবে এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “মুমিনরা মুমিনদের জন্য পিতা-পুত্র ও মনিব-গোলামের মতো, আর কাফিরদের ওপর কঠোরতার ক্ষেত্রে তাঁরা শিকারের ওপর হিংস্র প্রাণীর মতো।”<sup>৪</sup>

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ  
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ  
حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না; যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।<sup>৫</sup>

এ আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে মুমিনদের কোনো বন্ধুত্ব ও হৃদয়তা থাকতে পারে না বলে স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। চাই তারা কাফির হোক কিংবা নামধারী মুসলিম হোক, নিকটাত্মীয় হোক, দূরসম্পর্কীয় হোক কিংবা অপরিচিত হোক; সবার ক্ষেত্রে একই বিধান। এ আয়াতের ব্যাপকতা কেবল কাফিরদেরকেই নয়; বরং সীমালঙ্ঘনকারী ও জালিম শ্রেণির মুসলিমদেরকেও শামিল করেছে। অর্থাৎ এদের কোনো শ্রেণির প্রতিই দয়ামূলক আচরণ বা হৃদয়তা দেখানো যাবে না।

ইমাম কুরতুবি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

قَالَ أَشْهَبُ . اسْتَدَلَّ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مُعَادَاةِ الْقَدَرِيَّةِ وَتَرْكِ مُجَالَسَتِهِمْ عَنْ مَالِكٍ: لَا تُجَالِسِ الْقَدَرِيَّةَ وَعَادِيَهُمْ فِي اللَّهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: وَفِي مَعْنَى أَهْلِ الْقَدَرِ جَمِيعِ أَهْلِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ.

ইমাম মালিক রহ. এ আয়াত থেকে (বিভ্রান্ত বিদআতি ফিরকা) কাদরিয়া সম্প্রদায়ের সাথে শত্রুতাপোষণ ও তাদের সাথে সকল উঠাবসা বর্জন করার পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। আশহাব রহ. ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, “কাদরিয়াদের সাথে উঠাবসা কোনো না এবং আল্লাহর জন্য



তাদের সাথে শত্রুতা রাখো। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না।” (ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন,) আমি বলব, কাদরিয়াদের মতো সকল জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীরও একই বিধান।<sup>৬</sup>

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

‘তোমাদের জন্যে ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে ও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তা থেকে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের ও তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হলো চিরশত্রুতা ও ঘৃণা; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে। কিন্তু ইবরাহিমের পিতার উদ্দেশ্যে তাঁর এ উক্তি “আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোনো অধিকার রাখি না।” এই আদর্শের ব্যতিক্রম। (ইবরাহিম ও তাঁর অনুসারীগণ বলেছিল,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।<sup>৭</sup>

মুমিন ও কাফিরের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদের ক্ষেত্রে এ আয়াতটি খুবই স্পষ্ট। এ আয়াতে ইবরাহিম আ.-কে মুসলিম উম্মাহর আদর্শ ঘোষণা করে তাঁর এ মর্যাদার প্রধানতম কারণ বলা হয়েছে যে, তিনি কুফরার গোষ্ঠীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। ইমান না আনলে তাদের সবার সাথে শত্রুতা ও ক্রোধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আল্লাহর কাছে তাঁর এ ঘোষণা খুবই পছন্দ হয়েছে। কাফিরদের ব্যাপারে তাঁর এ অনমনীয় মনোভাব তাঁকে পুরো জাতির জন্য আদর্শ বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর এ কঠিন সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যেও সামান্য একটু নমনীয়তাব



রয়ে গিয়েছিল। আর সেটা হলো, তাঁর পিতার জন্য আলাদা করে ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়টি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেননি। কেননা, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কোনো সুযোগ নেই। আর তাই তাঁর এ বিষয়টিকে আদর্শ হওয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটা ছাড়া বাকি অন্য সব বিষয়ে তিনি পরবর্তীদের জন্য আদর্শ, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে নয়। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَقُولُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ بِمُصَارَمَةِ الْكَافِرِينَ وَعَدَاوَتِهِمْ وَمُجَانَبَتِهِمْ وَالْتِبَارِي  
مِهِمْ: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} أَي: وَاتَّبَاعُهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
{إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ} أَي: تَبَرَّأْنَا مِنْكُمْ {وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا  
بِكُمْ} أَي: بِدِينِكُمْ وَطَرِيقِكُمْ، {وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا} يَعْنِي: وَقَدْ  
شُرِعَتِ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ مِنَ الْآنِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، مَا دُمْتُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ فَتَحْنُ أَبَدًا نَتَبَرَّأُ  
مِنْكُمْ وَنُبْغِضُكُمْ {حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} أَي: إِلَى أَنْ تُوَحِدُوا اللَّهَ فَتَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا  
قَوْلَهُ: {إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ شَرِيكَ لَهُ، وَتَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُونَ مَعَهُ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ  
لَا تُسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} أَي: لَيْسَ لَكُمْ فِي ذَلِكَ أُسْوَةٌ، أَي: فِي  
الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَمُقَاتِلٌ، وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُ  
وَاحِدٍ... قَوْلُهُ: {إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} أَي:  
لَيْسَ لَكُمْ فِي ذَلِكَ أُسْوَةٌ، أَي: فِي الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ،  
وَقَتَادَةُ، وَمُقَاتِلٌ، وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ

‘আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন, যাদেরকে তিনি কাফিরদের সাথে বয়কট, শত্রুতা, দূরত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ দিয়েছেন, “তোমাদের জন্যে ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” অর্থাৎ তাঁর ওইসব অনুসারী, যাঁরা তাঁর সাথে ইমান এনেছিল। “যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের থেকে আমরা সম্পর্কমুক্ত।” অর্থাৎ তোমাদের সাথে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। “এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত করো, আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম।” অর্থাৎ তোমাদের দীন ও কর্মপদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করলাম। “আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হলো চিরশত্রুতা ও ঘৃণা।” অর্থাৎ এখন থেকে আমাদের ও তোমাদের মাঝে শুরু হলো শত্রুতা ও ঘৃণা। তোমরা যতদিন তোমাদের



কুফরির ওপর থাকবে, ততদিন আমরা তোমাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত থাকব এবং তোমাদের ঘৃণা করব। “যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।” অর্থাৎ যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, যাঁর কোনো শরিক নেই এবং তোমরা তাঁর সাথে যেসব উপাস্য ও মূর্তির উপাসনা করতে, তা বন্ধ করবে। ...আল্লাহর বাণী “কিন্তু ইবরাহিমের পিতার উদ্দেশ্যে তাঁর এ উক্তি ‘আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোনো অধিকার রাখি না।’ এই আদর্শের ব্যতিক্রম।” অর্থাৎ এ বিষয়টিতে তিনি তোমাদের জন্য আদর্শ নন। অর্থাৎ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়ে। ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ রহ., কাতাদা রহ., মুকাতিল রহ., জাহহাক রহ.-সহ প্রমুখ এমনই বলেছেন।”

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

‘আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, মুমিনদের প্রতি কঠোরতর শত্রুতা পোষণকারী মানুষ হচ্ছে ইহুদি ও মুশরিকরা।’

শাইখ বিন বাজ রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

قوله تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين، وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين على معادات الكفار والمشركين عموماً وعلى تخصيص اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لنا، وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم

‘আল্লাহর বাণী “আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, মুমিনদের প্রতি কঠোরতর শত্রুতা পোষণকারী মানুষ হচ্ছে ইহুদি ও মুশরিকরা।” এতে স্পষ্ট



বুঝা যায় যে, সমগ্র কুফফার গোষ্ঠী আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের শত্রু। তবে এদের মধ্যে ইহুদি ও মূর্তিপূজারী মুশরিকরা মুমিনদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী। আর এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে ব্যাপকভাবে কাফির ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি ইহুদি ও মুশরিকদের কঠোর শত্রুতার বিপরীতে মুসলমানদেরকেও তাদের সাথে অধিক শত্রুতা রাখতে বলা হয়েছে। আর এটা তাদের চক্রান্ত ও শত্রুতা থেকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনকে অপরিহার্য করে।<sup>১০</sup>

ইয়াজ বিন হিমার রা. বর্ণনা করেন :

وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَتْلَعُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُوكَ، وَاعْزُهُمْ نُعْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ

‘আর কুরাইশকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আমি তখন বললাম, হে আমার রব, (আমি যদি এ কাজ করি,) তাহলে তো তারা আমার মাথা ভেঙে রুটির মতো (টুকরো টুকরো করে) ফেলবে! আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা যেভাবে তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তুমিও ঠিক সেভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করো। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আমি তোমাকে যুদ্ধে সাহায্য করব। (আমার পথে) ব্যয় করো, আমিও তোমার জন্যও ব্যয় করব। তুমি একটি বাহিনী প্রেরণ করো, আমি অনুরূপ পাঁচটি বাহিনী প্রেরণ করব। আর যারা তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।’<sup>১১</sup>

এ হাদিসে কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়তে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে আদেশ দিচ্ছেন। এর কারণে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিশোধের কথা জানালে আল্লাহ তাঁকে তাদের সীমালঙ্ঘনের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে





সাহায্য করার ওয়াদা করলেন। এখানে ব্যাপকভাবে কুরাইশদের ব্যাপারে যে অনমনীয়ভাবে দেখানো হয়েছে, এটাই একজন মুমিনের জন্য কাফিরদের সাথে দেখানো উচিত। হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় হত্যা করা থেকে কিছু মানুষ বাদ যাবে, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এ হাদিস থেকে তাদের সবার সাথে কঠোরতার ব্যাপারটি ব্যাপকই বুঝা যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ  
مَنْنِي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

‘আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে। সুতরাং যে তা বলবে, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ তার শাস্তি দেওয়া যাবে)। আর তার (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর জিম্মায়।’<sup>১২</sup>

এ হাদিসে কেবল মুমিনদেরই নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কাফিরদের জন্য কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। হয় মুসলমান হতে হবে, নয় জিজিয়া দিতে হবে, নয়তো মরতে হবে। এ তিনটির যেকোনো একটি বেছে নিতেই হবে। কারও জন্য এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথাকথিত মানবতাবাদীদের মতো কোনো দরদ দেখাননি যে, না তাকে বুঝানো হোক, তাকে সুযোগ দেওয়া হোক। এ কথা আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখা উচিত যে, মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় চলে আসার পর ইসলাম আর কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। কোনো ব্যক্তি বা কোনো স্বার্থের জন্য ইসলামকে নিচু বা ছোট করে রাখার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম সর্বদা উচু ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সदा উঁচুই থাকবে। যার মনে চায়, ইসলাম গ্রহণ করবে, যার মনে চায় জিজিয়া দিয়ে থাকবে, আর যার মনে চায় যুদ্ধ করে জাহান্নামে যাবে। এ হাদিসে তো সাধারণ সকল মুমিনকেই নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য হাদিসে শুধু কালিমা পাঠ করাকেই যথেষ্ট বলা





হয়নি; বরং সাথে ইসলামের বিধান পালনকেও আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছে। নইলে ছাড় দেওয়া হবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلُّوا صَلَاتِنَا،  
وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْنَا دِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا  
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

‘আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে। সুতরাং যখন তারা তা বলবে, আমাদের মতো সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, আমাদের জবেহকৃত পশু খাবে, তখন আমাদের ওপর তার রক্ত ও সম্পদ হারাম হয়ে যাবে। তবে ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ তার শাস্তি দেওয়া যাবে)। আর তার (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর জিম্মায়।’<sup>১০</sup>

এখানে ইমানের পাশাপাশি আবশ্যকীয় ইবাদতকে ও ইসলামের বিধিবিধান মেনে নেওয়াকেও শর্তারোপ করা হয়েছে। নইলে তাকেও শরিয়া অনুযায়ী শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণেই আবু বকর রা. জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, যা ইতিহাসে ‘রিদ্দার যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। ঘটনাটি সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরাইরা রা. বলেন :

لَمَّا تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ  
الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ  
لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا



يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاتِلِهِمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:  
فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ  
الْحَقُّ

‘আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর আবু বকর রা. যখন খলিফা হলেন এবং আরবের কিছু লোক (জাকাত দিতে অস্বীকার করায়) মুরতাদ হয়ে গেল, তখন উমর রা. আবু বকর রা.-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি সেসব লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম পরিত্যাগ করেনি; বরং কেবল জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে)? অথচ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে। সুতরাং যে তা বলবে, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ তার শাস্তি দেওয়া যাবে)। আর তার (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর জিম্মায়।” আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব, যারা সালাত ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা জাকাত হলো (শরিয়তের পক্ষ থেকে) সম্পদের (ওপর আরোপিত) হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা পশুর রশি দিতেও অস্বীকৃতি জানায়, যা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তারা আদায় করত, তাহলেও আমি জাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখছিলাম যে, আবু বকর রা.-এর হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের ব্যাপারে উন্মোচন করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক।<sup>১৪</sup>

এ হাদিসে আবু বকর রা.-এর দৃঢ় মনোভাব ও অমুসলিমদের ব্যাপারে তার কঠোর অবস্থান দেখে উমর রা.-এর মতো সাহাবিও প্রথমদিকে থমকে গিয়েছিলেন। তাঁকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে যখন আবু বকর রা.-এর সুদৃঢ় মনোভাব ও তাঁর বক্তব্য শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, আবু বকর রা.-ই সঠিক পথে আছেন। চিন্তা করে দেখুন, আবু বকর রা.-এর ইমান ও



কাফিরদের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা কতটা শক্তিশালী হলে এরকম কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি করেননি, যেখানে উমর রা.-এর মতো সাহাবিও প্রথম প্রথম বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেননি।

অথচ ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে কী ফয়সালা করা হবে, সে ব্যাপারে পরামর্শ করা হলে আবু বকর রা. নম্রভাবে বলেছিলেন, তাদেরকে হত্যা না করে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাঁর মত সমর্থন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু উমর রা. ও সাদ বিন মুআজ রা.-এর পরামর্শ ছিল, না, এদের প্রতি কোনোরূপ দয়া দেখানো হবে না। এদের প্রত্যেককে হত্যা করা হোক। শুধু তাই নয়; বরং প্রত্যেকে তার নিজের আত্মীয়কে হত্যা করবে। কিন্তু এ দু'জনের পরামর্শ গৃহীত হয়নি। পরে মুসলমানদের সিদ্ধান্তের ওপর তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন এবং আজাব একেবারে নিকটে চলে এসেছিল বলে সতর্ক করে দিলেন। এ কারণে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. কান্না করছিলেন। পরে উমর রা. এসে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার সঙ্গীদের পরামর্শ শোনায় আজ এমন এমন আয়াত নাজিল হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আজ যদি আজাব আসত তাহলে উমর রা. ও সাদ রা. ছাড়া কেউ মুক্তি পেত না!<sup>১৫</sup> এর পর থেকে আবু বকর রা.-ও কাফিরদের ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক ও কঠোর হয়ে যান। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি এক কাফিরকে এভাবে গালি দিয়েছিলেন, “তোর (উপাস্য) লাতের লজ্জাস্থান চোষ।”<sup>১৬</sup> আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অফাতের পর তাঁর কঠিন ও সুদৃঢ় মনোভাবের কথা তো একটু আগেই আমরা জানতে পারলাম।

এমন আরও অসংখ্য আয়াত, হাদিস ও সাহাবিদের ঘটনা রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ব্যাপকভাবে কাফিরদের সাথে কঠোরতা, শত্রুতা ও অনমনীয়তা রাখতে হবে। এটাই ইসলামের মূল নির্দেশ। কোথাও প্রয়োজন সাপেক্ষে (জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ কাফির হলে বা বিশেষ দাওয়াতের প্রয়োজনে) শিথিলতা সেটা ব্যতিক্রম। আর এমন ব্যতিক্রম সব জায়গাতেই থাকে। ব্যতিক্রম কখনো মূল হয় না এবং সেটা মূল বিধানে (কাফিরদের সাথে শত্রুতা ও বিরূপ মনোভাব রাখার ক্ষেত্রে) কোনো প্রভাব ফেলবে না। এ বিষয়ে আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ। তাই কাফিরদের সাথে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সদাচরণ ও নম্রতাব দেখানোকে যারা দলিল হিসেবে আনতে চান, তারা মূলত ইসলামের মূল নির্দেশকেই বিকৃত করে উপস্থাপন



করার প্রয়াস পায়। আলোচনা অধিক দীর্ঘ হওয়ার ভয় না থাকলে এখানে অন্যান্য সব দলিলই উল্লেখ করতাম। তবে আশা করি, বুঝমান সত্যানুসঙ্গানীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।



## কাফিররা হিদায়াত না পেলে আফসোস করা:

অনেক মানুষ আছে, যারা কাফিরদের হিদায়াতের জন্য প্রচেষ্টা করেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেন, যেন তারা মুসলিম হয়ে যায়। এত কিছুর পরও যখন তারা ইমান আনে না, তখন দায়িরা পেরেশান ও চিন্তিত হয়ে যায়। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও কাফিরদের হিদায়াত না দেখে একসময় এভাবে চিন্তিত ও পেরেশান হতেন। কিন্তু পরে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে এভাবে পেরেশান হতে নিষেধ করে দেন। কেননা, একজন দায়ির দায়িত্ব কেবল সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। কাফিরদেরকে মুসলমান বানিয়ে দেওয়া এবং হিদায়াতের ওপর উঠিয়ে দেওয়া দায়ির দায়িত্ব নয়।

হিদায়াত তো মূলত আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান সুপথ দান করেন, আর যাকে চান বিপথগামী করেন। অতএব, তাদের জন্য চিন্তা করে, পেরেশানি করে নিজেকে কষ্ট ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়। তাদের জন্য চেষ্টা আর হিদায়াতের দুআ; এতটুকুই যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত চিন্তা-পেরেশানিকরার কোনোই প্রয়োজন নেই। কুরআনে একাধিক জায়গায় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে এভাবে চিন্তিত ও পেরেশান হতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ  
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

যাকে তার মন্দ কাজ শোভনীয় করে দেখানো হয় ফলে সে এটাকে ভালো মনে করে (সে কি তার সমান, যে সৎকাজ করে?) নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান। অতএব, তাদের জন্য আক্ষেপ করে যেন আপনার প্রাণ চলে না যায়। তারা যা কিছু করে, আল্লাহ তা ভালো করে জানেন।<sup>১৭</sup>



মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

أَفَمَنْ حَسَنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ السَّيِّئَةَ مِنْ مُعَاصِي اللَّهِ وَالْكَفَرِ وَعِبَادَةِ مَا دُونَهُ مِنَ  
الْأَلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ فَرَأَاهُ حَسَنًا جَمِيلًا كَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَرَأَى الْحَسَنَ حَسَنًا وَالسَّيِّئَ  
سَيِّئًا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، فَلَا تُؤْثِرُكَ نَفْسُكَ حَزَنًا عَلَى  
كَفَرِ هَؤُلَاءِ الضَّالِّينَ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِقَبَائِحِهِمْ وَسَيِّئَاتِهِمْ عَلِيمًا أَسْوَأَ الْجَزَاءِ

‘শয়তান যে ব্যক্তির নাফরমানি, কুফরি কর্মকাণ্ড, বাতিল মাবুদ ও মূর্তির  
উপাসনাসহ বিভিন্ন অসৎকর্মকে শোভনীয় করে দেখায়, আর সেও সেটাকে  
উত্তম ও ভালো কর্ম মনে করে, সে কি তার মতো, যাকে আল্লাহ হিদায়াত  
দিয়েছেন, যদ্বরূন সে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলে জানে? বস্তুত  
আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান, তাকে বিপথগামী করেন, আর  
যাকে চান, সুপথপ্রাপ্ত করেন। অতএব, ওইসব পথভ্রষ্ট লোকদের কুফরি  
দেখে আপনি আক্ষেপে নিজেকে শেষ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা  
তাদের মন্দ কর্মসমূহের ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত, আর এর কারণে  
তাদেরকে ভয়ংকর প্রতিফল দেবেন।’<sup>১৮</sup>

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

‘তারা মুমিন হচ্ছে না দেখে আপনি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে  
পড়বেন।’<sup>১৯</sup>

আল্লামা সাদি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْذِرُ بِهِ النَّاسَ، وَيَهْدِي بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،  
فَيَهْتَدِي بِذَلِكَ عِبَادُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ، وَيَعْرِضُ عَنْهُ مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ، فَكَانَ يَحْزَنُ حَزَنًا



شديداً، على عدم إيمانهم، حرصاً منه على الخير، ونصحاً لهم. فلماذا قال تعالى عنه: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ} أي: مهلكها وشاق عليها، {أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} أي: فلا تفعل، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الهداية بيد الله، وقد أدبت ما عليك من التبليغ، وليس فوق هذا القرآن المبين آية، حتى نزلها، ليؤمنوا [بها] ، فإنه كاف شاف، لمن يريد الهداية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر به الناس، ويهدي به الصراط المستقيم، فيمتدي بذلك عباد الله المتقون، ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء، فكان يحزن حزناً شديداً، على عدم إيمانهم، حرصاً منه على الخير، ونصحاً لهم. فلماذا قال تعالى عنه: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ} أي: مهلكها وشاق عليها، {أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} أي: فلا تفعل، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الهداية بيد الله، وقد أدبت ما عليك من التبليغ، وليس فوق هذا القرآن المبين آية، حتى نزلها، ليؤمنوا [بها] ، فإنه كاف شاف، لمن يريد الهداية

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আয়াত দিয়ে মানুষকে ভীত প্রদর্শন করতেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতেন। ফলে এদ্বারা আল্লাহর মুত্তাকি বান্দারা সুপথপ্রাপ্ত হতো, আর দুর্ভাগার দল এ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করত। এতে তিনি প্রচণ্ড পেরেশান হয়ে যেতেন; তাদের ইমান না আনার চিন্তায় এবং তাদের সুপথপ্রাপ্তি ও কল্যাণের আশায়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বললেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ অর্থাৎ সম্ভবত আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন এবং কষ্টে ফেলবেন; এজন্য যে, তারা মুমিন হচ্ছে না। অর্থাৎ আপনি এমনটা করবেন না এবং তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে শেষ করবেন না। কেননা, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। আপনার ওপর পৌঁছানোর যে দায়িত্ব ছিল, তা আপনি আদায় করেছেন। সুস্পষ্টকারী এ কুরআনের উর্ধ্বে এমন কোনো নিদর্শন হতে পারে না, যা আমি অবতীর্ণ করব, যাতে করে তারা ইমান আনে। বস্তুত যারা সুপথ কামনা করে, তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট এবং এটাই তৃপ্তিদায়ক।<sup>২০</sup>

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا



তারা এ বাণীতে ইমান না আনলে সম্ভবত দুঃখে আপনি তাদের পেছনে  
নিজের জীবন শেষ করে দেবেন।<sup>২১</sup>

আল্লাহ ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّيًا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُزْنِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، لِيَتَرَكِبَهُمُ الْإِيمَانَ  
وَيُبْعِدَهُمُ عَنْهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ} [فَاطِرٌ: 8] ، وَقَالَ {وَلَا  
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} [النَّحْلُ: 127] ، وَقَالَ {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [الشُّعْرَاءُ: 3]  
بَاخِعٌ: أَيُّ مَهْلِكٌ نَفْسَكَ بِحُزْنِكَ عَلَيْهِمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ  
يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ} يَعْنِي: الْقُرْآنَ {أَسَفًا} يَقُولُ: لَا تَهْلِكْ نَفْسَكَ أَسَفًا. قَالَ فَتَادَةُ: قَاتِلِ  
نَفْسَكَ غَضَبًا وَحُزْنًا عَلَيْهِمْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَزَعًا. وَالْمُعْنَى مُتَقَارِبٌ، أَيُّ: لَا تَأْسَفْ عَلَيْهِمْ،  
بَلْ أُلْغِمْهُمْ رِسَالَةَ اللَّهِ، فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، فَلَا تَذْهَبْ  
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ

‘মুশরিকরা ইমান গ্রহণ না করায় এবং তা থেকে দূরে থাকায় তাদের ব্যাপারে  
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেরেশানি দেখে আল্লাহ  
তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, “অতএব,  
তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়।”<sup>২২</sup> আল্লাহ  
তাআলা বলেন, “আর আপনি তাদের জন্য পেরেশান হবেন না।”<sup>২৩</sup> আল্লাহ  
তাআলা বলেন, “তারা মুমিন হচ্ছে না দেখে আপনি হয়তো মনোকষ্টে  
আত্মঘাতী হয়ে পড়বেন।”<sup>২৪</sup> অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে আপনি  
নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, “তারা এ বাণীতে  
ইমান না আনলে সম্ভবত দুঃখে আপনি তাদের পেছনে নিজের জীবন শেষ  
করে দেবেন।” “এ বাণী” বলতে কুরআন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ  
বলেছেন, আপনি আক্ষেপ করে নিজের জীবন ধ্বংস করবেন না। কাতাদা রহ.  
(ব্যাখ্যায়) বলেন, এর অর্থ হলো, আপনি তাদের জন্য চিন্তা ও রাগে  
আত্মহনন করে ফেলবেন। মুজাহিদ রহ. বলেন, দুঃখ ও উৎকণ্ঠায়। উভয় অর্থ





প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করবেন না। বরং আপনি তো তাদের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব, যে সুপথ পাবে, সেটা তার নিজের কল্যাণের জন্যই; আর যে বিপথে যাবে, সে নিজের অকল্যাণেই পথদ্রষ্ট হলো। সুতরাং আপনি তাদের জন্য আফসোস করে নিজেকে শেষ করবেন না।’<sup>২৫</sup>

সুতরাং কাফিরদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়াই একজন দায়ির দায়িত্ব। যেহেতু হিদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ, মানুষের নয়, তাই দাওয়াত দেওয়ার পরও কেউ ইমান না আনলে তার জন্য কষ্ট বা ব্যথা পাওয়ার কিছু নেই। কাফিরদের ব্যাপারে কোনো ধরনের দয়া বা চিন্তা করা একজন মুমিনের জন্য শোভা পায় না। এজন্যই তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রা. নিজেদের নিকটাত্মীয়দেরকেও ছাড় দেননি। কেউ কেউ তো নিজের পিতা, ভাই ও ছেলেকে হত্যা পর্যন্ত করে দিয়েছেন। এ অপেক্ষা করেননি যে, দেখি তার ভাগ্যে হিদায়াত আসে কিনা। এটাই মূলত ইসলাম, যা দ্বীনি পরিচয়কেই বড় করে দেখে, রক্তের পরিচয় নয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা নিজেদের দুর্বলতাকেই ইসলাম বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করি। রাসূলের জীবনী আর সাহাবায়ে কিরামের আত্মত্যাগের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করলে এসব ভুল চিন্তা আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারত না। কিন্তু আমরা অধ্যয়নের পরিবর্তে নিজের বুঝকেই ইসলাম বানিয়ে নিতে পছন্দ করি। আল্লাহর কাছে আমরা দ্বীনের বিকৃতি সাধন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে হ্যাঁ, এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, কারও ব্যাপারে ইসলামের আশা করা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ না করে মারা গেলে মানসিকভাবে কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। এতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।



## কাফিরদের সাথে নম্রতা ও স্দাচরণ:

মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও নমনীয় মনোভাব, আর কাফিরদের সাথে ব্যাপকভাবে শত্রুতা ও কঠোর মনোভাব রাখাই ইসলামের মূল নির্দেশ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কখনো কাফিরদের সাথে নম্রতা দেখানোরও সুযোগ রয়েছে; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবশ্যিকও বটে। তবে এ ব্যতিক্রমের কারণে ইসলামের মূল নির্দেশে কোনো শিথিলতা সাব্যস্ত হয় না। এটা মূলত বিশেষ অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের কারণে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনবশত কিছু ব্যতিক্রম থাকে। কাফিরদের সাথে নম্রতা দেখানোর বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ। আমরা এখানে কয়েকটি স্থান উল্লেখ করছি, যেখানে কাফিরদের সাথে নম্রতা দেখানোর সুযোগ বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক : দাওয়াতের ক্ষেত্রে

আল্লাহ তাআলা বলেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে দাওয়াত দিন হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। আর তাদের সাথে বিতর্ক করবেন উৎকৃষ্টতম পন্থায়।<sup>২৬</sup>

আল্লাম ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَقُولُ تَعَالَى أَمْرًا رَسُولُهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَدْعُو الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ {بِالْحُكْمَةِ} قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَهُوَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ {وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} أَيُّ: بِمَا فِيهِ مِنَ الزُّوَاجِرِ وَالْوَقَائِعِ بِالنَّاسِ ذَكَرَهُمْ بِهَا، لِيَحْذَرُوا بِأَسَنِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} أَيُّ: مَنْ اخْتَلَجَ مِنْهُمْ إِلَى مُنَاطَرَةٍ وَجَدَالٍ، فَلْيَكُنْ بِالْوَجْهِ الْحَسَنِ بِرَفْقٍ وَلِينٍ وَحُسْنِ خِطَابٍ، كَمَا قَالَ: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ فَأَمْرُهُ تَعَالَى بِلَيْنِ الْجَانِبِ، كَمَا أَمَرَ مُوسَى [46]: أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [الْعُنْكَبُوتِ



وَهَارُونَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، حِينَ بَعَثْنَاهُمَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فَقَالَ: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ} [طه: 44]

‘আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ দিয়ে বলছেন যে, তিনি যেন মানুষকে আল্লাহর দিকে হিকমতের সাথে আহ্বান করে। ইবনে জারির তাবারি রহ. বলেন, হিকমত হলো, কুরআন ও সুন্নাহ, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর নাজিল করেছেন। সদুপদেশ অর্থ, কুরআনের বিভিন্ন ধমকি-ভীতি ও উপদেশমূলক মানুষের নানা ঘটনা, যেন লোকেরা আল্লাহর শাস্তির ভয় করে। “আর তাদের সাথে বিতর্ক করবেন উৎকৃষ্টতম পন্থায়।” এর অর্থ হলো, তাদের মধ্যে কারও সাথে বিতর্ক করার প্রয়োজন হলে সেটা যেন সুন্দরভাবে, নম্রতা ও ভদ্র সম্বোধনে হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে উৎকৃষ্টতম পন্থায় বিতর্ক করবে। তবে তাদের মধ্য হতে যারা জুলুম করেছে, তাদের সাথে নয়।”<sup>২৭</sup> আল্লাহ তাআলা নম্রপন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন। যেমন মুসা আ. ও হারুন আ.-কে ফিরআউনের নিকট দাওয়াত দিয়ে পাঠানোর সময় বলে দিয়েছিলেন “অতঃপর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা (আল্লাহকে) ভয় পাবে।”<sup>২৮ ২৯</sup>

এ থেকে বুঝা গেল, যখন কাফিরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তখন কঠোর আচরণ না করে নম্রভাবে দাওয়াত দেওয়া নিয়ম। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে দাওয়াতের এ মানহাজই স্পষ্ট হয়। তবে উল্লেখ্য যে, হারবি কাফিরদের ক্ষেত্রে দাওয়াতের এ নম্র পন্থা প্রযোজ্য নয়। কেননা, তাদেরকে শুধু ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াটাই যথেষ্ট। তাদের কোনো প্রশ্ন বা সংশয় থাকলে সেটাও তারা জেনে নিতে পারবে। কিন্তু দিনের পর দিন তাদেরকে লাগাতার সুযোগ দেওয়া হবে, এমনটি ইসলামে নেই। হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়তো জিজিয়া-কর দেবে নয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। সাহাবায়ে কিরামের জিহাদের ঘটনাবলী থেকে এর ভুরিভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে আমাদের মাঝে এ বিষয়টি পরিচিত নয়। আমাদের প্রজন্মের অধিকাংশ লোকই মনে করে, দাওয়াত সবাইকে খুব নরমভাবে নত হয়ে ধীরেসুস্থে দিতে হবে। কিন্তু না, এটি ভুল ধারণা। হারবি কাফিরদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। হ্যাঁ, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এ সুযোগ ছিল। একবার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত



হওয়ার পর আর কখনো সে নিচু বা ছোট হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত সে উঁচু হয়েই থাকবে; যদিও তার অনুসারীরা জিহাদ ও শরিয়া প্রতিষ্ঠার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে দিনাতিপাত করুক না কেন। মোটকথা, কেবল জিম্মি কাফিরদের ক্ষেত্রেই এ নম্রতার অনুমোদন আছে, হারবি কাফিরদের ক্ষেত্রে নয়। এখানে হারবি কাফির বলতে উদ্দেশ্য ওই সব হারবি কাফির, যারা খলিফার সাথে চুক্তিবদ্ধ বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নয়। বাকি কথা হলো, বর্তমানে জিম্মি কাফিরের অস্তিত্ব আছে নাকি সবাই-ই হারবি কাফির, সেটা আলাদা আলোচনার বিষয়। আমরা প্রবন্ধটির শেষভাগে এ ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

## দুই : প্রতিবেশী ও মেহমানের ক্ষেত্রে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ইমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ইমান রাখে সে যেন তার মেহমানের কদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ইমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে বা নীরব থাকে।’<sup>৩০</sup>

এখানে ব্যাপকভাবে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলিমদের পাশাপাশি জিম্মিরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, দারুল ইসলামে মুসলিমরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পাবে, জিম্মিরাও তা পাবে; যদি না সেটা ধর্মীয় কোনো বিষয় হয়। কেননা, ধর্মীয় বিষয়ে উভয়ের বিধান আলাদা আলাদা। তাই প্রতিবেশী ও মেহমান অমুসলিম হলেও তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। এখানেও চুক্তিহীন হারবি কাফিরদের ব্যাপারে একই কথা। তাদের না আছে কোনো নিরাপত্তা আর না আছে কোনো সম্মান।



তিন : অসুস্থতায় দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে

আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন :

كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمَ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

‘এক ইয়াহুদি বালক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমত করত। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল -সে তার নিকটই ছিল- পিতা তাকে বলল, আবুল কাসিম (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা মেনে নাও। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে বের হতে হতে বললেন, যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলেন।’<sup>৩১</sup>

অমুসলিমদের অসুস্থতায় দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটি মতানৈক্যপূর্ণ। কারও মতে জায়িজ, আর কারও মতে জায়িজ নয়। উভয় পক্ষেই দলিল আছে। তবে সব দলিল সামনে রাখলে প্রতীয়মান হয় যে, যদি তার অসুস্থতায় দেখতে যাওয়ার কারণে তার ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে, তাহলে যাওয়া যাবে; নয়তো নয়। উপরিউক্ত হাদিসেও দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদি বালককে দেখতে গিয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন আর সে তা কবুলও করেছে। তাই এ ধরনের বিষয় থাকলে যাওয়া ঠিক আছে। তবে উলামায়ে কিরাম এখানে আরও দুটি শর্তের কথা বলেছেন। এক : তাদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা কালচার ইত্যাদি চলাকালীন যাওয়া যাবে না। দুই : তাদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কোনো দুআ করা যাবে না। যেমন : আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করুন ইত্যাদি।



চার : লেনদেন করার ক্ষেত্রে

আয়িশা রা. বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ইহুদি থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকিতে কিছু খাবার কিনেছিলেন এবং তার কাছে লোহার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।’<sup>৩২</sup>

এ ধরনের আরও বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যদ্বারা প্রমাণ হয় যে, জিম্মিদের সাথে লেনদেন করা যাবে। আর লেনদেনের ক্ষেত্রে সুন্দর ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত লেনদেনে যদি বাকি থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার কাম্য।

এভাবে ইসলাম জিম্মিদের সাথে পার্থিব বিষয়াদিতে নম্র ও ভদ্র আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে। তবে দ্বীনের ক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি। অনুরূপ চুক্তিহীন হারবি কাফিরদের ব্যাপারেও ইসলামে কোনো ছাড় বা সুযোগ দেওয়া হয়নি। অনেকে এ পার্থক্য না বুঝার কারণে দেখা যায়, জিম্মিদের জন্য প্রযোজ্য বিধান হারবিদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে। অথচ উভয়ের বিধানের মাঝে কত ব্যবধান রয়েছে! এ পর্যায়ে আমরা কিছু ভাইয়ের কতিপয় সংশয় ও তার নিরসন নিয়ে কথা বলব, ইনশাআল্লাহ।



## কতিদয় সংশয় ও তার নিরসন:

### ১ নং সংশয় :

অনেকের ধারণা, কাফিরদের সাথে সদাচরণ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, এটাই ইসলামের নির্দেশ। তারা মনে করে, ইসলাম হলো উদারতার ধর্ম। সব ধর্মকেই সে শ্রদ্ধা করে এবং সব ধর্মের লোকদের সাথেই উত্তম ও ভালো আচরণ করতে নির্দেশ দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, কেবল যেসব সৈনিক সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিংবা যারা তাদের ওপর নির্যাতন করবে, কেবল তাদেরকেই প্রতিহত করা বা তাদের বিরোধিতা করা যাবে। এছাড়া বাকি সকলের সাথে মুসলমানদের মতোই ভালো ও সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। তারা তাদের দাবির পক্ষে কুরআনের এ আয়াতটি পেশ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يَهْدِيكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।<sup>৩৩</sup>

এ আয়াতকে সামনে রেখে তারা বলে, এ আয়াতে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং যারা তাদেরকে তাদের দেশ থেকে বের করে দেয় না, তাদের সাথে সদাচরণের কথা বলা হয়েছে। অতএব, কেবল যেসব সৈন্য বা প্রশাসন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করছে কিংবা দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে, -আর এদের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই অল্প- তারা ছাড়া বাকি সকল কাফিরের সাথে সদাচরণ ও ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদের সুখে সুখী এবং তাদের দুঃখে দুঃখী হতে হবে! বর্তমান সময়ে জন্মসূত্রে মুসলিম পরিচয়ধারীদের অনেকেই এমন আকিদা ও বিশ্বাস রাখে।





নিরসন :

এখানে কি কেবল সরাসরি যুদ্ধরত কাফির ছাড়া অন্য সকল কাফিরের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে নাকি আয়াতের অর্থ ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু না বলে চলুন বিজ্ঞ মুফাসসিরদের থেকে বিষয়টি জেনে নিই।

ইমাম রাজি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

اِخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَأَلَاكَتُرُونَ عَلَى أَنَّهُمْ أَهْلُ الْعَهْدِ الَّذِينَ عَاهَدُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ، وَالْمُظَاهَرَةِ فِي الْعِدَاوَةِ، وَهُمْ خُرَاعَةُ كَانُوا عَاهَدُوا الرَّسُولَ عَلَى أَنْ لَا يُقَاتِلُوهُ وَلَا يُخْرِجُوهُ، فَأَمَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبِرِّ وَالْوَفَاءِ إِلَى مُدَّةِ أَجْلِهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُقَاتِلِينَ وَالْكَلْبِيِّ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الَّذِينَ وَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهَا نَزَلَتْ . آمَنُوا بِمَكَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرُوا، وَقِيلَ: هُمُ النَّسَاءُ وَالصَّبَبِيَانُ فِي أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَدِمَتْ أُمُّهَا فَتِيلَةَ عَلَيْهَا وَهِيَ مُشْرِكَةٌ يَدَايَا، فَلَمْ تَقْبَلْهَا وَلَمْ تَأْذَنْ لَهَا بِالِدُخُولِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُدْخِلَهَا وَتَقْبَلَ مِنْهَا وَتُكْرِمَهَا وَتَحْسُنَ إِلَيْهَا. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْهُمْ الْعَبَّاسُ أَخْرَجُوا يَوْمَ بَدْرٍ كُرْهًا، وَعَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْمَرُوا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَقْرَبَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَصْلُوهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، وَقِيلَ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَقَالَ فَتَادَةُ نَسَخَهَا آيَةُ الْقِتَالِ

‘মুফাসসিরগণ “যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না” এ আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এরা হলো জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ ওই সব কাফির, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ না করা এবং শত্রুদের সাহায্য-সহযোগিতা না করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। আর তারা হলো খুজাআ গোত্র। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছিল যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং তাঁকে (তাদের ভূমি থেকে) বের করে দেবে না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে ভালো আচরণ ও চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এটা ইবনে আব্বাস রা., মুকাতিল বিন হাইয়ান রহ., মুকাতিল বিন সুলাইমান





রহ. ও কালবি রহ.-এর মত। মুজাহিদ রহ. বলেন, এরা ওই সব লোক, যারা মক্কায় ইমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি। কারও মতে এরা হলো নারী ও শিশুরা। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, এটা অবতীর্ণ হয়েছে আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর কারণে। ঘটনা হলো, তাঁর মা ফাতিলা মুশরিক অবস্থায় কিছু হাদিয়া নিয়ে তাঁর নিকট আসলেন। তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতিও দিলেন না। অতঃপর (ঘটনা জানার পর) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যেন সে তাঁর মাকে ঘরে প্রবেশ করায়, তার উপটৌকন গ্রহণ করে তাকে সম্মান দেয় এবং ভালো আচরণ দেখায়। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এরা হলো বনি হাশেমের কিছু লোক, যাদের মধ্যে আব্বাস রা.-ও আছেন। তাদেরকে বদরের দিন জোরপূর্বক (যুদ্ধ করার জন্য) নিয়ে আসা হয়েছিল। হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, মুসলমানেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিজেদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। কারও মতে, এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কাতাদা রহ. বলেন, কিতালের আয়াত এটাকে রহিত করে দিয়েছে।<sup>৩৪</sup>

কী বুঝলেন! পূর্বে যেমন সরলভাবে বুঝেছিলেন যে, সরাসরি যুদ্ধরত কাফির ছাড়া অন্য সবার সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করতে হবে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা দেখার পর কি সে বুঝ সঠিক বলে মনে হয়? বস্তুত এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। কাতাদা রহ.-সহ অনেকের মতে তো এ আয়াতটির বিধান রহিতই হয়ে গেছে। আর কারও কারও মতে, এখানে বিশেষ শ্রেণির কাফিরদের কথা বলা হয়েছে, ব্যাপকভাবে সবার কথা বলা হয়নি। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মত এটাই যে, এটি চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। আর চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের ব্যাপারটি তো ফিকহের কিতাবগুলোতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, তাদের সাথে আচরণ কেমন হবে। সুতরাং যেসব কাফির মুসলমানদের খলিফার সাথে চুক্তিবদ্ধ নয়, -চাই তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত থাকুক কিংবা না থাকুক- তাদের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে এ আয়াত দ্বারা দলিল দেওয়া কীভাবে সঠিক হয় যে, তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে?



মোটকথা, এ আয়াত থেকে শুধু এতটুকু প্রমাণ হয় যে, চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের সাথে অসদাচরণ ও জুলুম করা যাবে না। বরং চুক্তি অনুযায়ী তারাও যেমন মুসলমানদের থেকে নিরাপদ থাকবে তদ্রূপ মুসলমানরাও তাদের থেকে নিরাপদ থাকবে। এটাই ইসলামের বিধান। হাদিসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া আছে। কিন্তু যারা জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ নয়, তাদের ব্যাপারে ইসলাম এমন নমনীয় হওয়ার কথা কোথাও বলেনি। ইসলাম তাদের কোনো ধরনের জিম্মাদারি নেয়নি। তাই বিভিন্ন আয়াত কিংবা হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা না জেনে ভুলভাল অর্থ ও ব্যাখ্যা করে উম্মাহকে ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেওয়া সুস্পষ্ট অপরাধ ও চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন।

## ২ নং সংশয় :

আব্দুর রহমান বিন আবু লাইলা রহ. বর্ণনা করেন :

كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيُّ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا

‘সাহল বিন হুনাইফ রা. ও কায়স বিন সাদ রা. কাদিসিয়াতে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন লোকেরা তাদের সামনে দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তারা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের বলা হলো, এটা তো এ দেশীয় জিম্মি ব্যক্তির (অমুসলিমের) জানাজা। তখন তাঁরা বললেন, (একদা) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দিয়ে একটি জানাজা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির জানাজা! তিনি ইরশাদ করলেন, সে কি মানুষ নয়?‘<sup>৩৫</sup>

এ হাদিসের ভিত্তিতে কারও কারও ধারণা, কাফিররা সম্মানিত জাতি এবং তাদেরকে সম্মান জানাতে গিয়েই নাকি এক ইহুদির লাশ দেখে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেছেন! আর এরই ভিত্তিতে তারা মনে করে, পৃথিবীর সকল কাফিরের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ এমনই যে, তাদের সম্মানের চোখে দেখতে হবে! তাদের সুখে সুখী হতে হবে, তাদের দুঃখে দুঃখী হতে হবে! বস্তুত ইলম থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে থাকলে যেমনটা হয় আর কি!



কোন জায়গায় মাসআলা কোথায় যে নিয়ে যায়, তা না নিজে জানে, আর না তাদের সমমনা লোকেরা উপলব্ধি করে!

এ কথাটা কার না অজানা যে, কাফিররা হলো লাঞ্চিত ও ঘৃণ্য জাতি। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অপদস্ত করেছেন। পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে বেশি ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ। তাদের অপরাধের মাত্রাটাও সবচেয়ে বেশি।

কুফর এমন এক অপরাধ, পৃথিবীর তাবৎ অপরাধকে এক পাল্লায় রেখে কুফরকে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে কুফরের পাল্লা অনেক বেশি ভারী হবে। এমন জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিও যদি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানিত হয়, তাহলে স্বয়ং সম্মানেরই যে অসম্মান হয়ে যায়! কাফিরদের সাথে দীর্ঘ দিন ধরে থাকার ফলে কুফর যে মারাত্মক এক অন্যায় এবং সকল অন্যায়ের প্রধান, সে অনুভূতি আজ আমাদের মুসলিম সমাজ থেকে অনেকটা হারিয়েই গেছে। আর তাই দুয়েকটা হাদিসের অনুবাদ দেখে এমন বিকৃত ইসলামের চর্চা চলছে। আল্লাহ আমাদের এমন বিকৃত ইসলাম থেকে রক্ষা করুন।

বস্তুত কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিকে সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়াননি; -আর এটা কখনো কল্পনাও করা যায় না- বরং মুহাদ্দিসিনে কিরাম অন্যান্য সব বর্ণনাকে সামনে রেখে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন :

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ: "إِنَّ لِلْمُوتِ فَرْعًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا

‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাজা গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাজা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আমরা যখন জানাজা বহন করার জন্য এগিয়ে গেলাম, দেখলাম সেটা এক



ইহুদির জানাজা। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই মৃত্যুর একটি আতঙ্ক আছে। অতএব, তোমরা কোনো জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যাও।<sup>৩৬</sup>

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বর্ণনা করেন :

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكُفَّارِ  
فَنَقُومُ لَهَا؟ . قَالَ: نَعَمْ، قُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي  
يَقْبِضُ النَّفْسَ

‘এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করত বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের সামনে দিয়ে কাফিরদের জানাজা যায়, আমরা কি তা দেখে দাঁড়াব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা তা দেখে দাঁড়িয়ে যাও। কেননা, তোমরা জানাজার লাশের কারণে দাঁড়াচ্ছ না; বরং তোমরা দাঁড়াচ্ছ ওই সত্তার সম্মানার্থে, যিনি প্রাণসমূহ কবজা করেন।’<sup>৩৭</sup>

আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন :

أَنَّ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا  
جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ দিয়ে এক ইহুদির জানাজা অতিক্রম করলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এটা তো এক ইহুদির জানাজা! তখন তিনি বললেন, আমি ফেরেশতাদের খাতিরে দাঁড়িয়েছি।’<sup>৩৮</sup>

মুহাম্মাদ বিন আলি রহ. বর্ণনা করেন :

جِنَازَةٌ مَرَّتْ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَقَعَدَ ابْنُ



عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ  
فَقَامَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، وَقَدْ جَلَسَ، فَلَمْ يُنْكِرِ الْحَسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا

‘হাসান রা. ও ইবনে আব্বাস রা.-এর পাশ দিয়ে একটি জানাজা গেলে হাসান রা. দাঁড়ালেন আর ইবনে আব্বাস রা. বসে রইলেন। তখন হাসান রা. ইবনে আব্বাস রা.-কে বললেন, আপনি কি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেননি যে, তাঁর সামনে দিয়ে জানাজা গেলে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস রা. জবাবে বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু পরে তিনি বসে থাকতেন। এটা শুনে হাসান রা. ইবনে আব্বাস রা.-এর কথা প্রত্যাখ্যান করলেন না।’<sup>৩৯</sup>

আলি রা. বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ قَامَ لَهَا، ثُمَّ تَرَكَ الْقِيَامَ فَلَمْ  
يَكُنْ يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا رَأَاهَا

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রথম দিকে) জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। পরে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি জানাজা দেখলে আর দাঁড়াতেন না।’<sup>৪০</sup>

মুহাম্মাদ বিন আলি রহ. বর্ণনা করেন :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ مَرَّ بِهِمْ جِنَازَةٌ، فَقَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ، فَقَالَ الْحَسَنُ: مَا  
صَنَعْتُمْ؟ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْذِيًا بِرِيحِ الْيَهُودِيِّ

‘হাসান রা. -এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, একবার লোকদের সামনে দিয়ে একটি জানাজা গেল। সব লোক দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু হাসান রা. দাঁড়ালেন না। অতঃপর হাসান রা. বললেন, তোমরা কী করলে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ইহুদির দুর্গন্ধে কষ্ট পাওয়ার কারণে  
দাঁড়িয়েছিলেন।<sup>৪১</sup>

মুহাম্মাদ বিন আলি রহ. বর্ণনা করেন :

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ،  
فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا  
جَالِسًا، فَكَّرَهُ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسُهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ

‘হাসান বিন আলি রা. বসা ছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে একটি জানাজা গেল।  
সেটা দেখে লোকেরা সবাই জানাজা অতিক্রম করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল।  
অতঃপর হাসান রা. (তাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তায় বসা ছিলেন, আর তখন একটা ইহুদির জানাজা  
নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি এটা অপছন্দ করলেন যে, কোনো ইহুদির  
জানাজা তার মাথার ওপরে থাকবে; তাই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।<sup>৪২</sup>

এ ধরনের বিভিন্ন বর্ণনাকে সামনে রেখে মুহাদ্দিসিনে কিরাম বলেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদির সম্মানার্থে দাঁড়াননি। অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি মৃত্যুর  
চিন্তায় বা আল্লাহর কথা স্মরণ করে কিংবা ফেরেশতাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছিলেন। বরং কিছু  
কিছু বর্ণনা থেকে তো জানা যায় যে, এ বিধান প্রথমে ছিল, পরে রহিত হয়ে গেছে। অতএব,  
এটা দ্বারা কাফিরদের সম্মান করার বিষয়টি প্রমাণ করা পুরোটাই অজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

৩ নং সংশয় :

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় চাচা আবু তালিব মারা গেলে তিনি  
খুবই ব্যথিত হন এবং সে বছরকে ‘আমুল হাজান’ বা দুঃখের বছর বলে নামকরণ করেন। যদি  
কাফিরদের ক্ষেত্রে ইসলাম এত কঠোরই হতো, তাহলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
তাঁর কাফির চাচার মৃত্যুতে এত কষ্ট কেন পেলেন আর এত দুঃখই বা কেন প্রকাশ করলেন?



এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, নিরীহ কাফিরের মৃত্যুতে কষ্ট পাওয়া ও দুঃখ প্রকাশ করা জায়িজ?

নিরসন:

:

ইসলামের বিধিবিধান জানা বা বুঝার জন্য শুধু কিছু ঘটনা বা কিছু হাদিস জানলেই যথেষ্ট নয়; বরং এভাবে শরিয়ি বিষয়ে নাক গলাতে গেলে উল্টো অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এখানে অনেক মূলনীতি রয়েছে, যা ছাড়া শরিয়তের কোনো বিধান সঠিকভাবে নির্ণয় করা বা বের করা সম্ভব নয়। এসব মূলনীতির মধ্য হতে একটি হলো, নাসিখ-মানসুখের ইলম। অর্থাৎ কোনো বিধান কার্যকর হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো, বিধানটি মানসুখ বা রহিত না হওয়া। ইসলামের প্রথম দিকে অনেক কিছু জায়িজ ছিল, অনেক কিছুতে ছাড় ছিল, কিন্তু পরে তা সব রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বের কোনো রহিত বিধান উল্লেখ করে কেউ যদি তা ইসলামের শাস্ত্র বিধান বলে দাবি করে তাহলে তা ইসলামের বিকৃতি বৈ কিছু নয়। আবু তালিবের মৃত্যুর ঘটনা মক্কায়ে ঘটেছে, যখন ইসলামের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বিধানই আসেনি। তখন কেবল তাওহিদ ও ইমানের আলোচনাই বেশি ছিল। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিহাদ, পর্দার বিধান, সুদের বিধান কিছুই ছিল না। এমনকি কাফিরদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ, তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, বন্ধুত্ব না রেখে শত্রুতা রাখা কোনোটিই ছিল না। তাই সে সময়ের কোনো ঘটনা দিয়ে ইসলামের মৌলিক বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা পুরোটাই ভুল।

তাছাড়াও আবু তালিবের দ্বারা যেহেতু ইসলামের ক্ষতির পরিবর্তে উপকারই হচ্ছিল, সে হিসেবে তার মৃত্যুতে মানসিকভাবে কষ্ট পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এ কষ্ট এজন্য নয় যে, তার রক্তের কেউ মারা গেছে। বরং কষ্টটা ছিল এজন্য যে, তার কারণে যেহেতু ইসলামের প্রচার-প্রসার বেশি হচ্ছিল, দাওয়াতের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যাচ্ছিল, নিরাপত্তা পাওয়া যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে তাঁর কষ্ট পাওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, সে ইসলাম গ্রহণ না করায় তার নিজের ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু সে ইসলামের পক্ষে কোনো ক্ষতি করেনি; বরং উপকারই করে গেছে সারাজীবন। তাই তার মৃত্যুতে ইসলামের কাজে কিছুটা ক্ষতি ও বাধা চলে আসায় তাঁর এ কষ্ট ও শোক মূলত ইসলামের জন্যই ছিল। এর বিপরীতে আমাদের মুসলিম ভাইদের নিরীহ

(!) কাফিরদের জন্য যে মায়াকান্না, সেটা ইসলামের কোন উপকারের কথা স্মরণ করে হয়?

আর কাফিরদের কি আদৌ নিরীহ বলা সঠিক? অথচ সে আল্লাহ, রাসুল ও ইসলামদ্রোহী। যেখানে একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে সর্বোচ্চ ঘৃণার চোখে দেখা হয় এবং তার সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হয়, সেখানে আল্লাহদ্রোহী, রাসুলদ্রোহী ও দীনদ্রোহী একজন ব্যক্তিকে কোন অর্থে নিরীহ



বলা হবে, তা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম কোনো কাফিরকে কখনো নিরীহ অভিধায় অভিহিত করতে পারে না। নিরীহ তো সে, যার কোনো দোষ নেই। কাফিররা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করেও যদি নিরীহ হয়, তাহলে দুনিয়ায় অপরাধীটাকে, শূনি? তবে হ্যাঁ, তাকে হত্যা করা হবে কিনা, নারী-শিশুদের জন্য ছাড় আছে কিনা, এগুলো ভিন্ন বিষয়। আমাদের আলোচনা কেবল তাদের ব্যাপারে কঠোরতা ও শত্রুতা রাখা নিয়ে। যুদ্ধ ও হত্যার বিধান আলাদা, যা ফিকহের কিতাবসমূহের বিস্তারিত লেখা আছে।





## বর্তমান বিশ্বে জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের অস্তিত্ব:

কাফিরদের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ছাড় ও শিথিলতা রয়েছে, তা যে সব কাফিরের জন্য প্রযোজ্য নয়, পূর্বে আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে। কুরআন-হাদিসে অমুসলিমদের সাথে যত নম্রতার কথা পাওয়া যায় কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের জীবনীতে যে উদারতা, নমনীয়তা ও আদর্শের দেখা মেলে, তার প্রায় সবই জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। আর বলার অবকাশ রাখে না যে, জিম্মি ও হারবি কাফিরদের বিধান এক নয়। পার্থিব বিষয়াদিতে উভয়ের বিধানের ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমান সময়ের কাফিররা হারবি নাকি চুক্তিবদ্ধ? জাতিসংঘ বা অন্যান্য কুফফার গোষ্ঠীর সাথে কৃত চুক্তি কি শরিয় চুক্তি বলে বিবেচিত হবে?

প্রথমত, আমাদের জানা থাকা দরকার যে, হারবি কাদেরকে বলা হয়। অনেকের ধারণা, হারবি তাকেই বলে, যে মুসলমানদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। শব্দের একটি অর্থ (তথা যুদ্ধ) থেকেও অনেকের এ সংশয় হয়। কিন্তু এর যে আরও অর্থ (তথা দূরত্ব ও বিদ্বেষ) আছে এবং সে অর্থ অনুসারেই হারবিকে হারবি বলা হয়, তা অনেকেরই জানা নেই। ফুকাহায়ে কিরাম কেবল যুদ্ধরত কাফিরকেই হারবি বলেন না; বরং এর অর্থ আরও ব্যাপক।

ইমাম আবুল ফজল বা'লি রহ. বলেন :

"الْحَرْبِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَرْبِ، وَهُوَ الْقِتَالُ، وَدَارُ الْحَرْبِ، أَيُّ: دَارُ التَّبَاعُدِ وَالْبَغْضَاءِ، فَالْحَرْبِيُّ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي

“হারবি” শব্দটা হারবের দিকে সম্বোধিত। হারব অর্থ যুদ্ধ। আর “দারুল হারব” অর্থ পারস্পরিক দূরত্ব ও বিদ্বেষের রাষ্ট্র। “হারবি”-কে এই দ্বিতীয় অর্থ তথা দূরত্ব ও বিদ্বেষের বিচারেই হারবি বলা হয়।<sup>৪০</sup>

শরিয় পরিভাষায় যে সকল কাফির-মুশরিক মুসলমানদের সঙ্গে জিম্মাচুক্তি, সন্ধিচুক্তি বা নিরাপত্তাচুক্তিতে আবদ্ধ নয়, তাদেরকে হারবি কাফির বলা হয়।



যেমন আল-মওসুআতুল ফিকহিয়াতে এদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

هُمْ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عَقْدِ الدِّمَةِ، وَلَا : أَهْلُ الْحَرْبِ أَوْ الْحَرْبِيُّونَ  
يَتَمَتَّعُونَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَنْدَهُمْ

‘হারবিগণ হলো ওই সব অমুসলিম, যারা কোনো জিম্মাচুক্তিতে প্রবেশ করেনি  
আর না মুসলমানদের কোনো সন্ধি বা নিরাপত্তাচুক্তির মাধ্যমে সুযোগ লাভ  
করেছে।’<sup>৪৪</sup>

এখানে আমাদের আরও তিনটি শব্দের অর্থ বুঝে রাখা উচিত। এক : জিম্মি। জিম্মি বলা হয় এমন কাফিরকে, যে দারুল ইসলামে জিজিয়া দিয়ে মুসলমানদের মতোই নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বসবাস করে। দুই : মুআহিদ বা চুক্তিবদ্ধ। চুক্তিবদ্ধ বলা হয় এমন কাফিরকে, যে তার নিজ দেশ দারুল হারবে বসবাস করে, কিন্তু তার দেশের সাথে খলিফার চুক্তি হয়েছে যে, তারাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, আর মুসলিমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তিন : মুসতা’মিন বা নিরাপত্তাপ্রার্থী। মুসতা’মিন বলা হয় এমন কাফিরকে, যার দেশের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি নেই। কিন্তু সে খলিফা বা তার কোনো প্রতিনিধির কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করেছে; ব্যবসা করা কিংবা দ্বীন শেখা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে।<sup>৪৫</sup>

এ তিন ধরনের কাফিরই মুসলিমদের হাতে নিরাপদ। চুক্তি ও সবকিছু ঠিক থাকা পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা করা যাবে না, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা যাবে না এবং তাদের ইজ্জতের ওপর কোনোরূপ আঘাত হানা যাবে না। এ তিন প্রকারের বাইরে যত কাফির আছে, সব অনিরাপদ। তাদের দুনিয়াতেও কোনো নিরাপত্তা নেই, আর আখিরাতে তো নেই-ই। দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে তারা লাঞ্চিত। বুঝা গেল, পুরো পৃথিবীতে কেবল চার শ্রেণি লোকই মুসলমানদের হাতে নিরাপদ। এক : নিজের জাতি ভাই তথা তাওহিদে বিশ্বাসী মুসলিম। দুই : জিম্মি। তিন : সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ। চার : নিরাপত্তাপ্রার্থী। পৃথিবীতে এর চার শ্রেণি মানুষ ছাড়া কেউই মুসলমানদের হাতে নিরাপদ নয়। তবে এটার ভিত্তিতে যেখানে-সেখানে মারামারি বা যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া জায়িজ হবে না। বরং তাদের সাথে যুদ্ধ, সম্পদ লুণ্ঠন এগুলো আলাদা মাসআলা। দুটোকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। আমাদের আলোচনা কেবল পৃথিবীতে নিরাপদ কারা, তাদের



লিস্ট দেওয়া। বাকি অনিরাপদ কাফির যারা, তাদের জন্য ভিন্নভাবে বিধান জেনে সে অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। মনে চাইলেই যেখানে-সেখানে ইচ্ছেমতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। এখন কথা হলো, বর্তমান বিশ্বে জিম্মি, চুক্তিবদ্ধ ও নিরাপত্তাপ্রার্থী কাফিরের অস্তিত্ব আছে কিনা। এটা মূলত নির্ভর করে আরেকটি মাসআলার ওপর। আর সেটা হলো, বর্তমান বিশ্বে দারুল ইসলাম এবং খলিফা আছে কিনা। থাকলে তাদের সাথে এ ধরনের কোনো চুক্তি হয়েছে কিনা। এটাও দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ একটি বিষয়। সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, বর্তমানে জিম্মি, চুক্তিবদ্ধ ও নিরাপত্তাপ্রার্থী বলতে কোনো কাফিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কেননা, এগুলোর জন্য দারুল ইসলাম থাকা ও খলিফার সাথে চুক্তির বিষয় রয়েছে। যেখানে খলিফাই নেই, সেখানে চুক্তি করবে কার সাথে? আমাদের জানামতে বর্তমানের সব কাফিরই হারবি। হারবির বাইরে কোনো কাফির থাকলেও থাকতে পারে, তবে সেটা আমাদের আমাদের জানার বাইরে। জাতিসংঘের চুক্তিকে অনেকে মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি বলে মনে করে। কিন্তু এটা পুরোপুরি অজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। জাতিসংঘ কেন গঠিত হয়েছে, তাদের লক্ষ্য কী, তাদের নীতিমালা ও আচরণ কেমন ইত্যাদি না জেনেই অনেকে এমন কথা বলে থাকেন। জাতিসংঘের ইতিহাস ও তাদের গোপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে। আল্লাহ আমাদের অজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কথা বলা থেকে রক্ষা করুন। পাশাপাশি ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইত্যাদির ব্যাপারেও গভীর পড়াশোনা লাগবে। এসব না জেনে আন্দাজে কথা বলার লোকের অভাব নেই আমাদের এ সমাজে। এসব বিষয় বুঝতে হলে আমাদের দারুল হারব ও দারুল ইসলামের বিষয়টিও বুঝা দরকার। এ ব্যাপারে একটি নাতিদীর্ঘ আর্টিকেল লিখেছিলাম। কখনো সময় ও সুযোগ হলে সেটাও আপলোড করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে দ্বীন বুঝার তাওফিক দিন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন।



## রেফারেন্স:

১। সুরা ফাতহ: ২৯।

২। তাফসিরু ইবনি কাসির : ৭/৩৩৭, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত। সুরা আল-মায়িদা : ৫৪।

৪। তাফসিরুল কুরতুবি : ৬/২২০, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো।

৫। সুরা আল-মুজাদালা : ২২।

৬। তাফসিরুল কুরতুবি : ১৭/৩০৮, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো।

৭। সুরা আল-মুমতাহিনা : ০৪।

৮। তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/১১৬, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

৯। সুরা আল-মায়িদা : ৮২

১০। মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বাজ : ২/১৮২, প্রকাশনী : মুহাম্মাদ বিন সাদ শুওয়াইয়ির কর্তৃক প্রকাশিত।

১১। সহিহ মুসলিম : ৪/২১৯৭, হা. নং ২৮৬৫, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যা, বৈরুত।

১২। সহিহুল বুখারি : ৪/৪৮, হা. নং ২৯৪৬, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত।

১৩। সহিহুল বুখারি : ১/৪৭, হা. নং ৩৯২, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত।

১৪। সহিহ মুসলিম : ১/৫১, হা. নং ২০, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যা, বৈরুত।

১৫। সহিহ মুসলিম : ৪৬৮৭, মুসনাদু আহমাদ : ১৩৯০৪, তাফসিরুত তাবারি : ১১/২, তারিখুত তাবারি : ২/৫৫, আদ-দুররুল মানসুর : ৪/৪৯৩, আল-আওসাত : ১০/১২৩।

১৬। মুসনাদু আহমাদ : ১৮৯১০।



১৭। সূরা ফাতির : ০৮।

১৮। আত-তাফসিরুল মুয়াসসার : পৃ. নং ৪৩৫, প্রকাশনী : মাজমাউল মালিক ফাহাদ, সৌদিআরব।

১৯। সূরা আশ-শুআরা : ০৩।

২০। তাফসিরুস সাদি : পৃ. নং ৫৮৯, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

২১। সূরা আল-কাহফ : ০৬।

২২। সূরা ফাতির : ০৮।

২৩। সূরা আন-নাহল : ১২৭।

২৪। সূরা আশ-শুআরা : ০৩।

২৫। তাফসিরু ইবনি কাসির : ৫/১২৪, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

২৬। সূরা আন-নাহল : ১২৫।

২৭। সূরা আল-আনকাবুত : ৪৬।

২৮। সূরা তহা : ৪৪।

২৯। তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৫২৬, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

৩০। সহিহ মুসলিম: ১/৬৯, হা. নং ৪৮, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত।

৩১। সহিহুল বুখারি : ২/৯৪, হা. নং ১৩৫৬, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত।

৩২। সহিহুল বুখারি : ৩/৮৬, হা. নং ২২৫২, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত।

৩৩। সূরা আল-মুমতাহিনা : ০৮।

৩৪। তাফসিরুর রাজি : ২৯/৫২১, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত।

৩৫। সহিহুল বুখারি : ২/৮৫, হা. নং ১৩১২, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত।



৩৬। সহিহ ইবনি হিব্বান : ৭/৩২২, হা. নং ৩০৫০, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

৩৭। আল-মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/৫০৯, হা. নং ১৩২০, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

৩৮। আল-মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/৫০৯, হা. নং ১৩২১, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

৩৯। মুসনাদু আহমাদ : ৩/২৫১, হা. নং ১৭২৬, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

৪০। আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৪/৪৩, হা. নং ৬৮৮৫, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

৪১। মুসনাদু আহমাদ : ৩/২৪৮, হা. নং ১৭২২, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

৪২। সুনানুন নাসায়ি : ৪/৪৭, হা. নং ১৯২৭, প্রকাশনী : মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব।

৪৩। আল-মুতলি' আলা আলফাজিল মুকনি' : পৃ. নং ২৬৯, প্রকাশনী : মাকতাবাতুস সাওয়াদি।

৪৪। আল-মওসুআতুল ফিকহিয়া : ৭/১০৪, প্রকাশনী : অজারাতুল আওকাফ, কুয়েত।

৪৫। আল-মওসুআতুল ফিকহিয়া : ৭/১০৪-১০৫, প্রকাশনী : অজারাতুল আওকাফ, কুয়েত।

